পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

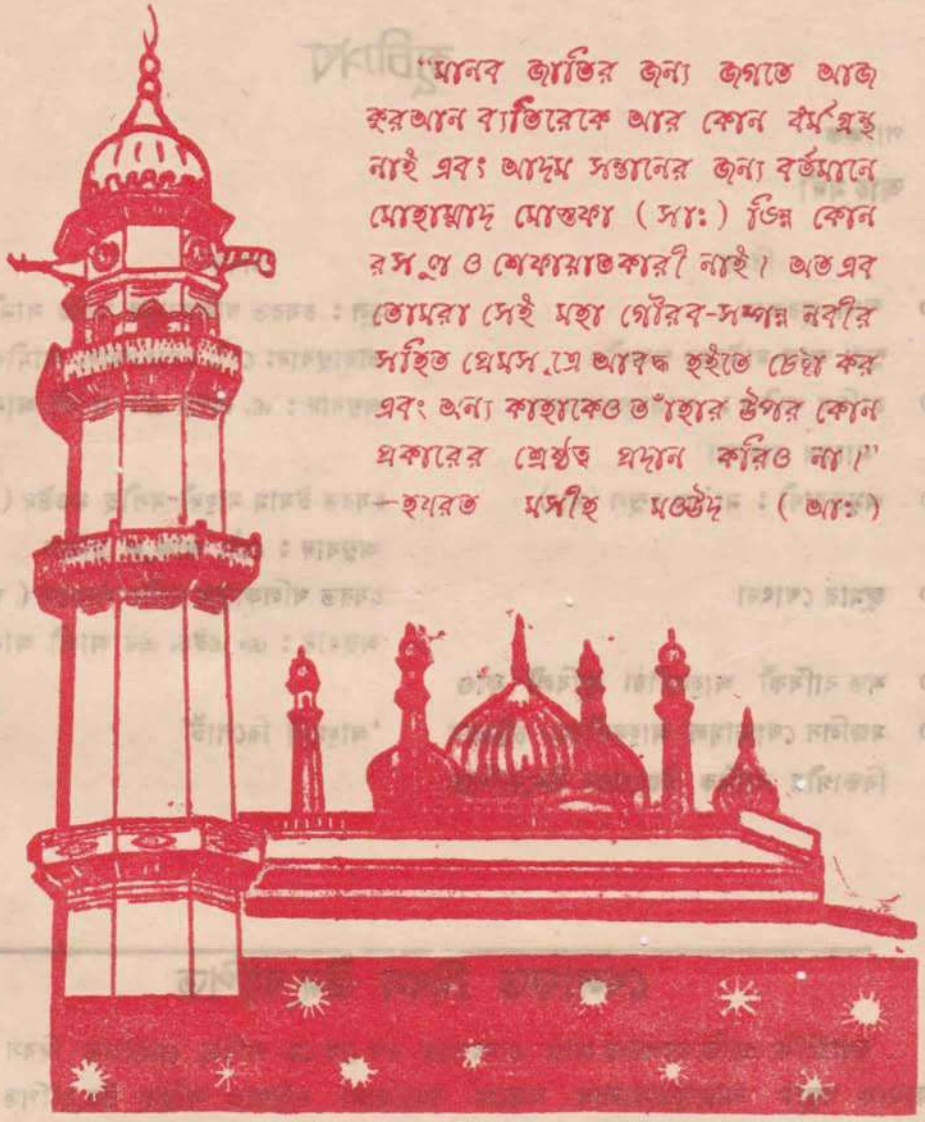

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৩য়া সংখ্যা

১লা আষাঢ় ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই জুন ১৯৭৬ ইং : ১৬ই জমাদিউস সানী ১৩৯৬ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩০ শ বর্ষ
আহ্মদী ৩রা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ আল-কুরআন : সুরা আল-মাউনের তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃআঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : আল্লাহ্তায়ালার নামের মাহাত্ম্য	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	১২
০ অমৃতবাণী : না'তে রসুল (সাঃ)	হযরত ইমাম মাহ্দী-মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : চৌঃ আব্দুল মতিন	১৩
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	১৫
০ শত বার্ষিকী আহ্মদীয়া জুবিলী ফাণ্ড		২২
০ মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার চট্টগ্রাম বিভাগীয় বার্ষিক ইজতেমা উদ্‌যাপিত	'আহ্মদী রিপোর্ট'	২৩

খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

যথারীতি প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৭ শে মে পবিত্র খেলাফত দিবস সকল শাখা জামাত সমূহে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন জামাতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার বিস্তারিত বিবরণ আহ্মদীতে স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া আমার দুঃখীত। আহ্মদীর গত সংখ্যায় ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশের পর আরো যে সকল জামাতের পক্ষ হইতে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল : তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা (নন্দনপুর), ময়মনসিংহ, সুন্দরবন।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৩রা সংখ্যা

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বাং : ১৫ই জুন, ১৯৭৬ ইং : ১৫ই ইহ্সান, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন

সুরা আল্-মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ);

ভাবানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ।

دين দীন শব্দের আর এক অর্থ হইল ملة মিল্লাত্। মিল্লাতের অর্থ দুই প্রকার। এক হইল শরীয়ত বা মযহব এবং দ্বিতীয় হইল জাতীয়তা। কিন্তু দীন ও মিল্লাতের মধ্যে প্রভেদ আছে। আমরা আল্লাহ্র দীন বলি। কারণ শরীয়ত আল্লাহ্র নিকট হইতে আসে। কিন্তু আমরা মিল্লাতুল্লাহ্ বলি না। কারণ জাতীয়তার সহিত আল্লাহ্তায়ালার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি জাতীয়তার উর্ধে। সুতরাং ধর্মের অর্থে দীন শব্দ মিল্লাতের শামিল, কিন্তু জাতীয়তার অর্থে মিল্লাত্ দীনের অন্তর্ভুক্ত নহে। মিল্লাতের আর এক অর্থ খেদমত। আরবীতে دين القوم خدمتهم বলিতে কওমের খেদমতকে বুঝায়। فذلك الذى يدع اليتيم আয়াত কওমী খেদমতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং দীন শব্দের অর্থ কওমী খেদমতকেও বুঝাইবে। এতীম, মিসকীনদের প্রতি দয়া করা কওমী খেদমত। অনুরূপভাবে পরস্পরকে ছোটখাট জিনিষ দিয়া সাহায্য করাও কওমী খেদমত। এ সম্বন্ধে ويمنعون الماعون আয়াতে উল্লেখ আছে। এই সকল কাজকে উপেক্ষাকারীদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ارءيت الذى يكذب بالدين

অর্থাৎ "তুমি কি বলিতে পার ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি, যে কওমী খেদমতের অস্বীকারকারী বা যাহার মনে ও ব্যবহারে কওমী খেদমতের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।"

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন الكفر ملة واحدة কুফর এক মিল্লাত্। এখানে মিল্লাতের অর্থ শরীয়ত হইতেই পারে না। কারণ যতগুলি জাতি কুফরের সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহাদের সকলের শরীয়ত এক নহে। ইহুদীগণ যতই মন্দে নিমগ্ন হউক, তাহারা যতই বিভ্রান্ত হউক, কিন্তু তাহারা এক খোদায় বিশ্বাসী। তাহাদের মোকাবেলায় খ্রীষ্টানগণও কাফের। সকল মসলার বুনিয়াদী মসলা তৌহীদের ব্যাপারে খৃষ্টানগণ ইহুদীগণের সহিত মতভেদ রাখে। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র এবং খোদা নিজ পুত্রের জন্মের জন্য মরীয়মকে যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একদল মরীয়মকে (নউযুবিল্লাহ) খোদার স্ত্রীরূপে মানে এবং তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। ইহুদী এবং খৃষ্টান একই ধর্মের দুই শাখা। তাহাদের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। আবার জরতস্তগণের শরীয়ত সম্পূর্ণ পৃথক। ইহুদীগণের বিশ্বাস এই দুনিয়ার নে'মত সমূহ আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষের নিদর্শন। অথচ জরতস্তগণ বলে, আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত নে'মত লাভের সময় মৃত্যুর পর আরম্ভ হয়। বাইবেল এবং ইঞ্জিল মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, পুরস্কার ও শাস্তি দুনিয়ায় নির্ধারিত করা হইয়াছে। কিন্তু জরতস্ত ধর্মমতে সকল প্রকার পুরস্কার পরলোকে নির্ধারিত আছে। যেন্দাবেস্তা মরণের পরবর্তী জীবনের উপর সকল গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরণের পরে পাপী দোযখে যাইবে এবং পুণ্যশীলগণ জান্নাত লাভ করিবে। এ বিষয়ে যিন্দাবেস্তা ও কুরআন করীমের শিক্ষা অভিন্ন। দেখিলে মনে হয় যেন উভয়ের উৎস একই। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগনের শিক্ষার সহিত যিন্দাবেস্তার শিক্ষার কোন মিল নাই। পক্ষান্তরে আবার হিন্দু ধর্মের সহিত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষার কোন মিল নাই। হিন্দু ধর্মে সকল জোর বংশগত মর্যাদার উপর দিয়াছে, যদ্বারা বিশেষ জাতি অপর জাতি সমূহের উপর প্রাধান্যের অধিকারী। হিন্দু ধর্ম মতে খোদাতায়ালা তাহার সকল পুরস্কার ঐ জাতির মারফৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহুদী ধর্মেও জাতীয় আভিজাত্যের শিক্ষা আছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের পর্যায়ে নহে। ইহুদী ধর্মে অপর জাতিগণকে হিন্দু ধর্মের ন্যায় গোলাম বানাইবার ও অছুত গণ্য করিবার শিক্ষা দেয় না। আবার পুন র্জন্মের বিশ্বাসের ব্যাপারে দেখা যায় যে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও জরতস্তীগণ ইহা মানে না। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) الكفر ملة واحدة অর্থাৎ, কুফর এক

ধর্ম বলিতে ইহা বুঝান নাই যে, তাহাদের আকীদা বা এবাদতের পদ্ধতি বা কেতাব এক। কারণ আমরা পরিস্কার দেখিতে পাইতেছি যে, তাহাদের এবাদত পৃথক, তাহাদের আকীদা পৃথক এবং তাহাদের কেতাব পৃথক। সুতরাং এই হাদীসে মিল্লাত বলিতে শরীয়তকে বুঝাইবে না। বরং ইহার অর্থ হইবে ইসলামের মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল ধর্মের অনুগামীগণ একদল ভুক্ত। সুতরাং তাহাদের সকলের সম্বন্ধে মুসলমানগণকে সদা সজাগ ও হুশিয়ার থাকিতে হইবে। ইসলামের মোকাবেলায় তাহাদিগকে পৃথক পৃথক সত্বা হিসাবে দেখিলে চলিবে না। ইসলামের মোকাবেলার প্রশ্নে তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া যায়। ইসলামের গত চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উক্ত হাদীসের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ বহন করিতেছে। মুসলমান শাসকগণ ইহুদীগণের সহিত এত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার নজীর নাই। তাহারা তাহাদিগকে বড় বড় পদ মর্যদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা প্রতিদানে সদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী পরিচালনা করিয়াছে। মোগল বাদশাহগণ হিন্দুদের সহিত কত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু দেখা যায় প্রতিদানে তাহারা অবশেষে মুসলমানগণের দুশমন হইয়া যায়। শিখদের ঘটনা দেখ। মুসলমান বাদশাহগণ তাহাদিগকে অনেক রিয়াসত দান করেন। আহমদ শাহ আবদালী শিখ হুকুমতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের গুরদুয়ারার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বহু সম্পত্তি দান করেন। কিন্তু প্রতিদানে তাহারা সদা হিন্দুদের সহিত মিলিয়া গিয়া মুসলমানদের শত্রুতা কয়িয়াছে। একই অবস্থা পারসীগণের। খ্রীষ্টান জাতির কার্যকলাপ আমাদের সম্মুখেই বর্তমান। সুতরাং الكفر ملة واحدة হাদীসের অর্থ ইহা নহে যে, তাহাদের শরীয়ত এক। বরং ইহার অর্থ এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাহারা সদা একতাবদ্ধ হইয়া যাইতে থাকিবে। উক্ত হাদীসের সত্যতা বর্তমান যুগে ভয়াবহ আকারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আস্তিক ও নাস্তিক দুনিয়ার অপর সকল জাতি যে মুসলমানগনের দুশমন হইয়া একযোগে কাজ করিতেছে, তাহা যাহার চক্ষু আছে, তাহার দৃষ্টি এড়াইবে না। সুতরাং মুসলমানগণের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হওয়া এবং জাতির রক্ষাকল্পে সকল মুসলমাণের একতাবদ্ধ হওয়া কর্তব্য।

সুতরাং মিল্লাত শব্দের অর্থ দীন ছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ হওয়াকেও বুঝাইবে। জাতীয়তা বোধ ও জাতির খেদমত মিল্লাতের এক হিস্‌সা। সুতরাং ارئيت الذى يكذب بالدين আয়াতের অর্থ হইবে, "জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকারকারী? যে ব্যক্তি ইহা করে, সে সদা অধপতনের দিকে যাইবে।"

অহমদী

১৫ই জুন —১৯৬৭ ইং

অত্র আয়াতে নেকীর মূল সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিলে মন্দ কাজের দরজা খুলিয়া যাইবে এবং ঐগুলি পালন করিলে অধিক নেকী করিবার ক্ষমতা অর্জিত হইবে। ধর্মের অস্বীকার প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং যে নিজ প্রকৃতিকে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই ধর্মকে অস্বীকার করিবে। শুদ্ধ প্রকৃতি মানুষকে জাতীয় খেদমতে অনুরাগী করে। জাতির জন্য যে ব্যক্তি খেদমত করে, এবং জাতির প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেয়, সে স্বার্থপর ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী কাজ করে। অবশ্য কখনও কখনও ব্যক্তিগত হকের প্রশ্ন আসিয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাপারেও কোন কোন সময়ে চাপ দেওয়া পাপের কারণ হয়। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নে খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষা হইল প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না। কিন্তু খৃষ্টানগণ এই শিক্ষা পেশ করার সময় সত্যকথা বলে না। কারণ খৃষ্টানদের চেয়ে বেশী প্রতিশোধ দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত আর কোন জাতি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হইল ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োজন বোধে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, নচেৎ নহে। যদি দেখ যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে উপকার হইবে, তাহা হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, নচেৎ নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য হইল নেকী বিস্তার করা। যদি প্রতিশোধ লইলে নেকী বিস্তার লাভ করে, তাহা হইলে প্রতিশোধ লও এবং প্রতিশোধ না লইলে যদি নেকী বিস্তার লাভ করে, তাহা হইলে প্রতিশোধ লইও না। আরবদের কওমী খেদমত এবং কওমের জন্য কুরবানী করার অনুরাগ খুব বেশী ছিল। কোন কোন সময় ভ্রান্ত পথে চলিয়া তাহারা এ বিষয়ে এমন বাড়াবাড়ি করিয়াছে যে, তাহাদের কাজ নেকীর পরিবর্তে পাপে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায়, তাহারা দরিদ্রের সাহায্যের নামে যে যুদ্ধ চালাইয়াছে, উহা শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে। একবার এক আরবীর ক্ষেতে একটি কুকুর বাচ্চা প্রসব করিয়াছিল। অন্য একজনের ছাড়া উট দৈবাৎ আসিয়া কুকুরের একটি বাচ্চার উপর পা দিয়া চলিয়া গেলে, বাচ্চাটি মারা যায়। ক্ষেতের মালিক ভাবিল, কুকুর আমার ক্ষেতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উহার বাচ্চা যখন মারা গিয়াছে, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা আমার কর্তব্য। সে উটটিকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ঐ উটটি যে আরবের ছিল, তাহার বাড়ি ছিল অন্য জায়গায়। সে এ গ্রামে একজনের মেহমান ছিল। মেযবান মনে করিল আমার মেহমানের উট যখন মারিয়া ফেলিয়াছে, তখন আমার কর্তব্য ইহার বদলা লওয়া। তখন সে উটের হত্যাকারীকে মারিয়া ফেলিল। ইহাতে পরামর্শের জন্য নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাহাদের গোষ্ঠিকে জমা করিল। তাহারা ফয়সালা করিল যে, স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে বন্ধু গোষ্ঠি সকল একের পর এক

প্রতিশোধ যজ্ঞে যোগদান করিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে এক কুকুর বাচ্চার দৈবক্রমে মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া সারা আরব জুড়িয়া পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধ ছড়াইয়া গিয়া শত বৎসর ব্যাপি চলিতে লাগিল। আল্লাহ্তায়ালা যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আরবের হুকুমত দান করিলেন, তখন পর্যন্ত উক্ত প্রকার যুক্তিহীন প্রতিশোধ গ্রহণের যুপকাষ্ঠে হাজার হাজার জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং আরও শত শত ব্যক্তি প্রতিশোধের লক্ষ্যস্থল হইয়া মৃত্যু দণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই জন্য এই ফেতনাকে শেষ করার উদ্দেশ্যে হুজুর (সাঃ) বিদায় হজের উপলক্ষে যে উপদেশ বাণী দান করেন, উহার মধ্যে এ সম্বন্ধে বলেন যে আরবের বিভিন্ন কবিলার পক্ষ হইতে বিভিন্ন কবিলার লোকদের বিরুদ্ধে জীবন নাশের দায় কায়েম রহিয়াছে। কোনও না কোনও সময়ে ইহার অবসান হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ আরবের সব শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক খুনের বিচারভার হুকুমতের উপর ন্যাস্ত থাকিবে। কাহারও নিজ হস্তে বিচারভার গ্রহণের বা মৃত্যুদণ্ড দানের অধিকার থাকিবে না। অতীতের যত খুনের দায় আছে, আমি আজ সে সকল ক্ষমা করিয়া দিতেছি। আজ সে সবের মধ্যে কোন খুনের বদলা লওয়ার কাহারও অধিকার থাকিল না। এই ঘোষণার ফলে সকলের মনে গভীর প্রশান্তি নামিয়া আসিল এবং জাতির মধ্যে নিরাপত্তা কায়েম হইয়া গেল। যদি ঐ সব খুনের বদলা বাকী থাকিত, তাহা হইলে, ইসলামী যামানাতেও সারা আরব জুড়িয়া পরস্পরের মধ্যে রক্তপাতের সীমাহীন স্রোত প্রবাহিত থাকিত। হযরত রসুল করীম (সাঃ) জাতীয় খেদমতের এই ভ্রান্ত খেদমতের বৃত্তিকে এক পূন্য ধারায় পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা জাতির খেদমত নহে। বরং জাতিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা। এইভাবে তিনি কওমী খেদমতের সহি প্রেরণা দিয়া আরব দেশকে এক মহা বিপদ হইতে মুক্তি প্রদান করেন।

৩য় ১ দীনের আর এক অর্থ সংযম, পূর্বেই বলা হইয়াছে। সংযম এক বস্তু এবং কওমের খেদমত আর এক বস্তু সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা বাহ্যিক বিষয়। তুমি হয়ত বাম দিকে চলিতেছে। কিন্তু এ জন্য নহে যে তোমার হৃদয় ইহা চাহিতেছে। বরং তোমার মন হয়ত ডাহিনে চলিতে চাহিতেছে। তুমি বলিবে আমি কওমের হুকুম মানিয়া বামে চলিতেছি। পক্ষান্তরে কওমের খেদমতের অর্থ হইল, যদি ব্যক্তি দেখে যে, তাহার মৃত্যু বা ধ্বংসের মধ্যে জাতির মুক্তি ও জীবন রহিয়াছে, তাহা হইলে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, নিজেকে কুরবানী করিয়া দিবে। ইহার এ অর্থ নহে যে, ব্যক্তির স্বার্থের জন্য

জাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে। সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্ন নিহিত আছে। কিন্তু দেশ ও জাতির জন্য আনুরাগের মধ্যে কোন হুকুম থাকে না। তুমি যখন নিজ জাতি ও দেশের কল্যাণকামী হও, তখন তোমার জাতি ও দেশের প্রতি অনুরাগ জাতি ও দেশের স্বার্থের জন্য তোমাকে নিজেকে কুরবানী করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং সত্য সত্যই তুমি নিজেকে কুরবাণী করিয়া দিবে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এক স্থলে বিজলীর তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের গতি রোধ হইয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়াও জাপানীরা বেড়া অতিক্রম করিতে পারিতেছিল না। কয়েকজন জাপানী যুবক নিজদিগকে কুরবানী করিবার জন্য তৈয়ার হইয়া গেল। তাহারা নিজেদের পেটে বোমা বাঁধিয়া তারের বেড়ার উপর সজোরে গিয়া ধাক্কা খাইয়া পড়িল। ইহাতে বোমা ফাটিয়া তাহারা নিজেরা মারা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারের বেড়াও টুকরা টুকরা হইয়া গেল এবং সৈন্যদের অগ্রগতির জন্য বেড়া দূর হইয়া রাস্তা খুলিয়া গেল। ঐ যুবকগণকে কেহ এই প্রকার আত্মাহুতি দিতে আদেশ দেয় নাই। তাহারা স্বয়ং দেখিল যে, তাহাদের লস্কর যদি আটক পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে জাতির ক্ষতি হইবে। তাহাদের দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এখানে এই পন্থা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করা হইতেছে না। বরং এক বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইল, যদ্বারা কওমী খেদমতের জন্য কুরবানী এবং আনুগত্যের জন্য কুরবানীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর যখন খৃষ্টানগণের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, তখন এক বার শ্যামদেশে খৃষ্টানদের এক ভারি লস্কর জমা হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানরা তখন সংখ্যায় খুব কম হইয়া পড়িয়াছিল। খ্রীষ্টানগণ প্রথমে সংবাদ লইল যে, সাহাবা (রাঃ আঃ) কতজন এবং কে কে আছেন। অতঃপর তাহারা এক উঁচু টিলার উপর কয়েকজন তীরন্দাজকে উঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আদেশ দিল যে, যতদূর সম্ভব সাহাবা (রাঃ আঃ)-কে যেন আঘাতের লক্ষ্যস্থল করা হয়। তাহারা জানিত যে অগ্রগন্য ব্যক্তিগণ মারা গেলে বাকী ফউজের মনোবল ভাঙিয়া পড়িবে এবং তাহারা ময়দান ছাড়িয়া ভাগিয়া যাইবে। খ্রীষ্টানগণের চক্রান্তের ফলে কয়েকজন সাহাবা (রাঃ আঃ) মারা গেলেন এবং কয়েকজন চক্ষু হারাইলেন। ইহাতে মুসলমানগণ বড়ই দুশ্চিন্তা-গ্রস্থ হইল এবং বুঝিল যে, এখন আগে বাড়িলে সব সাহাবা (রাঃ আঃ) শেষ হইয়া যাইবেন। তখন সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া কয়েকজন যুবক জাতির জন্য

নিজদিগকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল এবং এতদুদ্দেশ্যে নিজদিগকে পেশ করিল। যে আবু জেহেলের গোষ্ঠি মককায় ইসলামের প্রতি দুশমনির বীজ বপন করিয়াছিল, সেই আবু জেহেলের পুত্র একরামা এই যুবকগণের মধ্যে কুরবানী দিতে অগ্রগামী ছিল। তাহারা বলিল, সাহাবা বহু বড় বড় খেদমত করিয়াছেন। আমরা যাহারা পরে আসিয়াছি, আমাদিগকে কিছু সওয়াব হাসিল করার সুযোগ দেওয়া হউক। আমরা মিলিতভাবে লস্করের কেন্দ্রস্থলে গিয়া আঘাত হানিব এবং খ্রীষ্টান জারনেলগণকে হত্যা করিয়া ফেলিব। লস্করের কমাণ্ডার হযরত আবু ওবায়দা বলিলেন, ইহা বড়ই ভীতি প্রদ প্রস্তাব। ইহাতে যতগুলি যুবক যাইবে, তাহারা সকলেই মারা যাইবে। তাহারা বলিল, এ কথা সত্য, কিন্তু ইহা ব্যতিরেকে কোন উপায়ও নাই। আপনি কি ইহা পছন্দ করিবেন যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিব এবং সাহাবা (রাঃ আঃ) মারা যাইবেন।" তখন তিনি খালেদ (রাঃ)-এর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। খালেদ (রাঃ) বলিলেন, "আকরামার অভিমত ঠিক। দুশমন আমাদের পীড়িত নাড়িকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা সাহাবা (রাঃ আঃ) কে শেষ করিতে চাহে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ষাটজন যুবককে সঙ্গে লইয়া দুশমনদের লস্করের বক্ষঃ স্থলে গিয়া আঘাত হানি।" তাঁহার বারম্বার অনুরোধে হযরত আবু ওবায়দা অনুমতি দিলেন। খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) ষাটজন যুবককে লইয়া দুশমনের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানিয়া তাহাজিগকে পরাজিত করিয়া দিলেন। খৃষ্টানদের লস্করের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এই যুদ্ধে যুবকগণের মধ্যে অধিকাংশ মারা যায়। এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, "যুদ্ধ শেষে যখমী লস্করের দেখা শুনা করার জন্য যখন আমি যুদ্ধের ময়দানে গেলাম, তখন দেখিলাম আবু জেহেলের ছেলে আকরামা আহত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। আমি ভাবিলাম, নিশ্চয় তাহার খুব পিপাসা লাগিয়াছে। আমার সঙ্গে এক পানির মশক ছিল। তাহাকে পানি পান করাইবার উদ্দেশ্যে মশকের মুখ, তাহার মুখে ধরিতে গেলাম। আকরামা তড়িৎ পার্শ্বে আহত ফযল বিন আব্বাসের প্রতি ইশারা করিয়া বলিল, 'আমা অপেক্ষা সে পিপাসায় বেশী কাতর এবং এখন আমা অপেক্ষা সে পানি পানের বেশী অধিকারী। সুতরাং আগে তাহাকে পানি পান করাও।' "

উক্ত সাহাবী যখন ফযলের নিকট গেলেন, তখন পার্শ্বে পতিত আর এক যখমী যুবকের দিকে ইশারা করিয়া সে বলিল, সে আমাদের অপেক্ষা বেশী পিপাসার্ত। আগে তাহাকে পানি পান করান। এইভাবে পর পর দশজন মুসলমান যুবক আহত হইয়া

পড়িয়াছিল। উক্ত সাহাবী বলিয়াছেন "প্রত্যেকের নিকট একই প্রকারের অনুরোধ শুনিয়া আমি যখন দশম ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম, তখন দেখিলাম সেও মারা গিয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক পূর্ব ব্যক্তিকে মৃত পাইয়া আকরামার নিকট যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম সেও মারা গিয়াছে। আমার হাতের মশক পানি-ভরা হাতেই ধরা রহিল। মরণ পথের যাত্রীরা সব মরণ বরণ করিয়া চলিয়া গেল, কেহ এক বিন্দু পানি পান করিল না। ইহা এই জন্য যে প্রত্যেকেই তাহার পার্শ্বে ধুলি শয্যায় পতিত আহত ভ্রাতাকে বেশী পিপাসাতুর মনে করিয়াছিল। ইহাকেই কওমী রুহ বলে, যাহার ফলে মানুষ নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়া কওমী জরুরতের ও মঙ্গলের জন্য নিজকে কুরবান করিয়া দেয়। কওমী খেদমতের দ্বারা কওমের জন্য কুরবানীর সহি প্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং যখনই কাহারও হৃদয়ে এই প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তখনই সে অশেষ কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। যাহার মধ্যে কওমী রুহ সৃষ্টি হয়, তাহার দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত হইয়া যায়। এ বিষয়ে একজন একান্ত দুর্বল ও মূর্খ ব্যক্তিরও চিন্তাশক্তি এত মৃত নহে, যতখানি তাহার সম্বন্ধে মানুষে কল্পনা করে। একজন একান্ত মূর্খ মাতাও তাহার সন্তান সম্বন্ধে কত যত্নশীলা হয়। সে তাহার বাচ্চার খুটিনাটি প্রয়োজন সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকে। তাহাকে সামান্য কষ্ট পৌঁছিতে দেয় না। গ্রাম্য দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে দেখা যায়, মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে নিজ পেটারী হইতে নূতন শাড়ি বাহির করিয়া মেয়েকে যৌতুক দিয়া থাকে। কখন ঐ শাড়ি কে খরিদ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, "দশ বৎসর পূর্বে আমি ইহা খরিদ করিয়াছিলাম, আজিকার দিনে মেয়েকে যৌতুক দানের উদ্দেশ্যে।" তাহার যদি বুদ্ধি না ছিল, তাহা হইলে সে এত লম্বা দিনের চিন্তা কিরূপে করিল। আবার অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীর নিকট মামলা খরচের টাকা না থাকিলে, স্ত্রী নিজ পুটলী হইতে টাকা খুলিয়া আনিয়া স্বামীকে দেয়। কোথা হইতে ঐ টাকা আসিল, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, দিনে দিনে কিছু কিছু করিলে রাখিয়া সে এই টাকা জমা করিয়াছিল, যাহাতে কোন জরুরতের সময় ইহা কাজে লাগে। সে এই জন্য ইহা করে যে, তাহার মধ্যে পারিবারিক কল্যাণের রুহ থাকে। এই রুহ তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বাধ্য করে এবং আগামীতে সম্ভাব্য বিপদাবলীর আশঙ্কা করিয়া উহার প্রতিবিধান কল্পে পূর্বাহ্নে সে এই পন্থা অবলম্বন করিয়া টাকা জমাইতে থাকে এবং উহার দ্বারা অসময়ে সাফল্যের সহিত সহজেই বিপদ কাটাইয়া উঠে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ছেলেমেয়ের লেখা পড়া, খাওয়া পরা, শাদি ইত্যাদি এবং কি ভাবে উক্ত দায় সমূহ উদ্ধার হইবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে। এই চিন্তাশক্তিকে যদি জাতির কল্যাণের জন্য পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে

প্রত্যেক ব্যক্তি জাতির প্রয়োজনের কথা ভাবিবে, এবং দেখা যাইবে যে, যাহাকে নেহাৎ অকেজো বলিয়া মনে হইত, তাহারও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। সুযোগ দিলে ছোট ছোট মানুষ হইতেও বড় বড় কথা পাওয়া যায়। জাতির সত্যিকার মঙ্গলের জন্য যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক, সত্য ও ন্যায্য ভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ দেওয়া হয় এবং তাহাদের সকলের বক্তব্যের উত্তম নির্যাস গ্রহণ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়, তখন উত্তম ফল প্রকাশিত হয়। যেমন জামাতে আহমদীয়ার মজলিশে মুশাওরতে এক জন নগন্য সদস্যেরও মতের প্রতি মর্য্যাদা সহকারে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং গ্রহণযোগ্য হইলে, গ্রহণ করা হয়। জামাতে আহমদীয়ার বিধান অনুযায়ী জামাতী কল্যাণের জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহকে প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় জামাতের মেম্বারগণকে তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখানে উত্তম ফয়সালা সংগৃহীত হয় এবং সেই সমূহকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে মুশাওরাতে বিবেচনা করা হয় এবং পুনর্বার সারা জামাতের মনোনীত সদস্যগণকে চিন্তিত অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবসমূহকে গ্রহণযোগ্য রূপ দেওয়া হয় অথবা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে ফয়সালা সমূহকে জামাতের খলিফা সকল দিক বিবেচনা করিয়া মঞ্জুরী দেন বা নাকচ করেন। এই পদ্ধতি দ্বারা জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্ক জামাতের কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত হয় এবং পরিণামে ব্যক্তি সমূহের মস্তিষ্কের উর্ধে এক জাতীয় মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়। যে জাতির মধ্যে এইরূপ মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়, অপর জাতি, যাহাদের মধ্যে ইহার উদ্ভব হয় নাই, তাহারা পূর্বোক্তের মোকাবেলায় তিষ্ঠিতে পারে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইসলামের শিক্ষার দ্বারা সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর মধ্যে ব্যক্তি মস্তিষ্কের যেমন এক দিকে চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাদের মধ্যে এক সর্বোত্তম জাতীয় মস্তিষ্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার সম্মুখে বিশাল রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয় তৃণখণ্ডের ন্যায় চোখের পলকে উড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমানগণ প্রত্যেক মনে করিতেন যে, তিনি নিজে কিছুই নহেন, যাহা কিছু সবই জাতি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য সাহাবা (রাঃ আঃ) যত কিছু কুরবানী করিয়াছিলেন, উহার মূলে ছিল এই কওমী মর্যাদাবোধ যে, কওমের মোকাবেলায় সব কিছু তুচ্ছ। তাঁহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ব্যক্তি হিসাবে দেখিতেন না, বরং তাঁহাকে তাহারা কওমী মাহাত্মের এক নিদর্শন রূপে দেখিতেন। সুতরাং তাঁহার জন্য যত কুরবানী করা হইয়াছিল, উহা ব্যক্তির জন্য না হইয়া, কওমের জন্য জন্য ছিল।

একদা এক যুদ্ধে দুশমনগনের পক্ষ হইতে মুষলধারে তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। হযরত তালহা (রাঃ) তাঁহার হাত হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকের সম্মুখে

তুলিয়া ধরিলেন, যাহাতে কোন তীর তাঁহাকে না লাগে। তিনি তাঁহার হস্তকে অবিকম্পিত অবস্থায় একভাবে ধরিয়া থাকিলেন। ফলে তাঁহার হাত চিরকালের জন্য অসাড় হইয়া যায়। কি অপূর্ব তাঁহার আত্মত্যাগ! তিনি মুহূর্তের জন্যও উহ্ শব্দ পর্যন্ত করেন নাই, পাছে হস্ত কাঁপিয়া গিয়া তীর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বিদ্ধ করে। পরবর্তীকালে তাঁহাকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি জানান যে তাঁহার মুখ হইতে উহ্ শব্দ বাহির হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু এই ভয়ে যে তিনি উহ্ করিলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তীর বিঁধিতে পারে, তিনি নিজেকে সংযত রাখেন। তখন তাঁহার মস্তিস্কে শুধু একটি চিন্তা জাগিতেছিল যে, আশে পাশে যখন আর কেহ রহিল না, তখন কওমকে অর্থাৎ কওমের প্রতীক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে রক্ষাকল্পে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ সকল সাহাবা একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

যখন ওহোদের যুদ্ধ শেষ হয়, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক সাহাবীকে যখমীগণের দেখা শুনা করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে পাঠাইলেন। তিনি এক আনসারীকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, ভাই তোমার কোন পয়গাম থাকিলে আমাকে বল, আমি তোমার আত্মীয় স্বজনগণকে গিয়া পৌঁছাইয়া দিব। তিনি বলিলেন, আমিও এক পয়গাম পাঠাইবার জন্য মদীনা যাওয়ার লোক খুঁজিতেছিলাম। ভালই হইল, আপনাকে পাইলাম। আপনি আমার হাতে হাত রাখিয়া কসম খান যে, এই পয়গাম পৌঁছাইবেন। সাহাবী যখন কসম খাইলেন, তখন মুমূর্ষ আনসারী বলিলেন, আপনি যাইয়া আমার আত্মীয় স্বজনগণকে বলিবেন, "হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জাতির সর্বোত্তম সম্পদ এবং তিনি এক কওমী আমানত, যাহা আমাদের নিকট আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমরাও ইহা মানো। যতদিন আমি জীবিত ছিলাম, ততদিন আমি এই আমানতের কোনরূপ খেয়ানত করি নাই এবং ইহার হেফাজতে আমি আমার সব শক্তি নিয়োগ করিয়া আজ আমি মরণ বরণ করিতেছি এবং এই পবিত্র আমানত পিছনে ছাড়িয়া যাইতেছি। আমি আশা করি আমার পুত্রগণ, আমার ভ্রাতাগণ এবং তাহাদের সন্তানগণ নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা এই পবিত্র আমানতের বেশী যত্নে হেফাযত করিবে। এ বিষয়ে কেহ কোনরূপ ত্রুটি করিবে না।"

যখন কোন মানুষ মরে, তখন সে নিজ স্ত্রীর কথা মনে করে, ছেলেমেয়ের কথা মনে করে, তাহাদের তরবীয়তের কথা মনে করে, দেনা পাওনার কথা মনে করে। কিন্তু আনসারী সাহাবীর মনে মরণকালে কোন কথার উদয় হইল? তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কওমের

তথা মানবজাতির, তথা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কথা। তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে শুধু নিজ কওমকেই নহে, বরং সমগ্র মানবজাতিকে কেন্দ্রীভূত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কওমী রুহ ব্যক্তির হককে ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং কেবল কওমকে এবং তাহার পবিত্র প্রতীককে দেখিতেছিল। মরণ সময়ে তিনি তাঁহার আত্মীয়গণকে বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা বলিলেন না, বরং তাহাদিগকে জীবন দান করার ওসিয়ত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিজ হিসসা লইবার নহে বরং নিজ হিসসা দিবার নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যক্তি এবং পরিবারের ইজ্জত এবং নিরাপত্তা জাতির ইজ্জত এবং নিরাপত্তার সহিত জড়িত। আজও যদি মুসলমানগণের মধ্যে এই কওমী রুহ সৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না।

যখন কোন জাতির মধ্যে কওমী মস্তিষ্ক সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন উহার লক্ষণ ইহাই হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কওমের কল্যাণের সম্বন্ধে চিন্তা করে। যখনই দুই চার ব্যক্তি একত্রিত হয়, তখন তাহারা এই আলোচনা করে যে, জামাতের মধ্যে অমুক কমজোরী আছে এবং অমুক ত্রুটি আছে এবং এই সবের প্রতিকার অমুক অমুক। অতঃপর এক মহল্লা হইতে অপর মহল্লায় গেলে, সেখানেও ঐ সকলের আলোচনা হয় এবং কমজোরী ও ত্রুটি সম্পর্কে প্রতিকারেরও আলোচনা হয়। এইভাবে মহল্লা হইতে শহরে এবং এক শহর হইতে অপর শহরে আলোচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে সারা দেশের মানুষ জাতির কল্যাণ সম্বন্ধে ভাবিতে এবং ফয়সালা করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে জাতির বিপদের সময়ে সকলের মধ্যে এক কওমী রুহ কাজ করিতে থাকে। বিপদের সময় এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ করিতে পারে না, বরং কওমী মস্তিষ্ক কাজ করিতে ও সফলতা লাভ করিতে পারে। কওমী মস্তিষ্ক তখনই জাগ্রত হয়, যখন সকল ব্যক্তির মস্তিষ্ক একই ভাব ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

উক্ত হকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন ارئيت الذى يكذب بالدين অর্থাৎ "তোমরা বল দেখি, কে কওমী খেদমতের প্রেরণাকে অস্বীকার করিতে পারে? যদি কেহ এরূপ থাকে, তাহা হইলে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াতে ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসী মুশরেকগণ ও অপরাপর কওমের মধ্যে এই প্রেরণা সক্রিয় না থাকায়, হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাহাদের একতা সাময়িক প্রতিপন্ন হইবে। শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রকাশ পাইবে। পক্ষান্তরে সাহাবা (রাঃ সাঃ)-এর মধ্যে তথা তৎকালীন মুসলমানগণের মধ্যে কওমী রুহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে, তাঁহাদের মধ্যে আমীর ও গরীব সকলে এক সুতায় গাঁথা মালার ন্যায় এবং এক আত্মা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন ছিল। তাঁহারা কওমী স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের বেদীতে কোন মূল্যেই বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে মুসলমানদের জয় এবং দুশমনদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। (ক্রমশঃ)।

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্ তায়ালার নামের মাহাত্ম্য

(১)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাজি আল্লাহ্ তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ব্যক্তি বাচক নাম ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বইটি গুণবাচ নাম আছে। যাবজ্জীবন যে ব্যক্তি ইহাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং ইহাদের প্রতিবিম্ব ও প্রকাশক হওয়ার চেষ্টা করিবে, সে জান্নাতে দাখিল হইবে।" এই নামগুলি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলেইহে ওয়াস সাল্লাম এই প্রকারে গণনা করিয়াছিলেন :—

"আল্লাহয়াতা'য়ালা, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য (মাবুদ) নাই, তিনি রহমান (অযাচিত ভাবে দানকারী)। রহীম), বার বার দয়া করী)। বাদশাহ্। সর্বপ্রকার অভাব ও ত্রুটি হইতে পবিত্র। যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষাকারী। নিরাপত্তা দাতা, রক্ষক। ক্ষতিপূরণ কারী। গৌরবান্বিত। স্রষ্টা, অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দাতা। অবয়ব দাতা। আচ্ছাদন দাতা। পর্দাপূশিকারী। সম্যক প্রধান। অব্যাহতি দাতা। জীবিকা দাতা। মুশকিল নিবারক। সর্বজ্ঞ। আক্রমণ রোধকারী। প্রশস্তি আনয়নকারী। নীচুকারী। উঁচুকারী। সম্মান দাতা, অবমাননা কারী। সর্ব শ্রোতা। সর্ব দ্রষ্টা। মীমংসাকারী। সুবিচারের কর্তা। সম্যক অবহিত। সর্ব জ্ঞানী। মহিয়ান। দোষ আচ্ছাদনকারী। মর্যাদাকারী, কদরদান কারী। মহা মর্যাদা বান। মহিমান্বিত মহা রক্ষক। মহা হিসাব গ্রহণকারী। মহা গৌরবময়। দয়ালু ও দয়াময়। নিগাহবান, পর্যবেক্ষক। প্রর্থানা মঞ্জুরকারী। প্রাচুর্য দাতা। প্রজ্ঞাময়। অত্যন্ত প্রেমময়। মহান। পুর্ণজীবন দাতা। সর্বস্রষ্টা। চিরনিপুণ, পূর্ণ শক্তিমান। মহা শক্তি প্রকাশক। সহায। প্রশংসার পাত্র। গণনাকারী। সত্য স্রষ্টা। পণঃস্রষ্টা। জীবন দাতা। মৃত্যুদাতা। জীবিত, চিরঞ্জীব ও স্বয়ম্ভু। অভাবহীন। সম্মানিত। অনুপম। অদ্বিতীয়। স্বাধীন। শক্তিশালী। পরাক্রমশালী। উন্নতিদাতা, অবনতি দাতা। আদি। শেষ। প্রকাশিত। গুপ্ত। সর্বময় কর্তা। উর্ধ। সাধুগণের সম্মানকারী। তৌবাগ্রহণ কারী। প্রতিশোধ গ্রহণ কারী। ক্ষমা-শীল। নম্র ব্যবহারকারী। রাজ্যাধিপ। মহা প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। সুবিচারক। একত্রকারী। অভাবহীন। অভাবনিরসকারী। ক্ষতিনিবারক। কল্যাণ দাতা। আলো। হেদায়েতকারী। অধিকারী, সর্বময়। নিত্যনূতন আবিস্কার কর্তা। স্থায়িত্ব দাতা। প্রকৃত কর্তা। পথপ্রদর্শক। শাস্তিদানে ধীর। (ক্রমশঃ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর

অমৃত বানী

না'তে রসুল (সাঃ)

১। কি আশ্চর্য্য নূরের প্রভা হৃদয় রাজ্যে মোহাম্মদের (সাঃ)!
কি আশ্চর্য্য জ্ঞানের গভীর হীরক খনি মোহাম্মদের !!

২। অন্ধকারের বন্ধ কারা মুক্ত তখন হয় যে পরান।
আসছে যে জন সঙ্গলাভে প্রেমিক দলে মোহাম্মদের ।।

৩। অবাক হেরি দুর্ভাগাদের অজ্ঞতার এই কদাচরণ।
দুর্ভাগা হায়! পরিহারে "দস্তর খান" মোহাম্মদের ।।

৪। জানিনা এই দু'জাহানে এরূপ আত্মা সম্ভবে কী।
কিঞ্চিদাধিক পেয়েছে কি 'শান'-শৌকত মোহাম্মদের ।।

৫। খোদাতায়ালার কোপানলে পোড়াবে তায় শতেক বারে।
ঈর্ষান্বিত প্রাণ যাদের প্রতিকুলে মোহাম্মদের ।।

৬। খোদার রোষে দগ্ধ করে, ধ্বংস করে মানব কীট।
শির উচায়ে দাঁড়ায় যখন দুশমনিতে মোহাম্মদের ।।

৭। চাহ যদি মুক্তি কেহ রিপুর মস্ত-তাড়ন হ'তে।
এস তবে ছায়া তলে প্রিয় প্রেমিক মোহাম্মদের ।।

৮। থাকে যদি প্রাণের পিয়াস খোদার প্রেমিক গণ্য হ'তে।
ত্বরায় এস খোদার প্রেমের হাম্‌দ গেয়ে মোহাম্মদের ।।

৯। তবুও যদি দলিল খোঁজ, এস তাঁহার আশেক দলে।
অতুল্য সেই স্বর্গ রতন 'মোহাম্মদই' মোহাম্মদের ।।

১০। আহ্‌মদেরই চলার পথের ধূলায় আমার শির যে লুটায়।
পরাণ আমার কোরবান যে প্রেমানলে মোহাম্মদের ।।

১১। দিব্যি করে বলছি আমি কেশস্পর্শে রসুলুল্লাহ্‌র।
লুপ্ত-আমি ভাস্কর উজল আনন-তাপে মোহাম্মদের ।।

১২। এই পথেতে দগ্ধহত হইবা যদি শতেক বারে।
তবু আমায় কে ফিরাবে আমায় হতে মোহাম্মদের ।।

১৩। ভয় করি না প্রভুর কাজে বিশ্ববাসীর কটাক্ষেতে।
দেখ্‌ছ নাকি সারা অঙ্গে রঙ লেগেছে মোহাম্মদের ।।

১৪। অতি সহজ বিদায় বার্তা এই দুনিয়ার পান্থ-শালায়।
স্মরণ রেখে কল্যাণকর কর্মজীবন মোহাম্মদের ।।

১৫। বিলুপ্ত মোর সারা অঙ্গের কনিকারাশি পন্থে তাঁহার।
দেখেছি যে লুকাইত রূপের স্বর্গ মোহাম্মদের ।।

১৬। কোনও গুরুর নাম জানিনা, শিষ্য নহি কারও আমি।
আমি শুধু পাঠ শিখেছি মকতবেতে মোহাম্মদের ।।

১৭। কোন সে প্রেমিক কাহার তরে কি কামনা আমার আছে।
শতবার যার পরাণ হত প্রেমের দ্বারে মোহাম্মদের ।।

১৮। থাকুক আমার নয়ন নেশা নিত্য তাঁহার দৃষ্টি পথে।
চিত্তবিনোদনের পিয়াস গুলবাগিচায় মোহাম্মদের ।।

১৯। খুঁজছ কেন কোথায় ব্যথা কোথায় দুঃখ অঙ্গে আমার।
জখমে মোর আরাম পট্টি পাকদামানের মোহাম্মদের ।।

২০। পূর্ণ গীতির গায়ক কুলের আমিই সেই স্বর্গ পাখী।
শীর্ষ শাখায় আসন আমার গুল বাগিচায় মোহাম্মদের ।।

২১। তাঁহার প্রেমের পূণ্যালোকে আলোকিত আমার পরান।
বিলুপ্ত মোর প্রানের প্রদীপ প্রাণ সকাশে মোহাম্মদের ।।

২২। আহা যদি হাজার প্রাণে কোরবান হই এই যে পথে।
তবু ভাবি হব কিনা গ্রহণ যোগ্য মোহাম্মদের ।।

২৩। দাও গো, সেই সত্য দৃষ্টি ধর্ম-যুদ্ধে শক্তি আমার।
আসবে কে মোর মোকাবিলায় এ ময়দানে মোহাম্মদের ।।

২৪। হের ওহে অজ্ঞ অরি পথভ্রষ্ট মানব রাশি।
সাবধান, এই শরীয়তী তরবারি মোর মোহাম্মদের ।।

২৫। কোথায় খোঁজ পথ হারা দল, কোথা পাবে পথের দিশা।
পথ দেখাবে তারাই ভবে আনসারুল্লাহ্‌ মোহাম্মদের ।।

২৬। হুসিয়ার, অস্বীকার-কারী জান কি তাঁর মর্য্যাদা কী।
আমিও তাঁর নূরের বিকাশ নূরের প্রতীক মোহাম্মদের।

২৭। ভাব্‌ছ কি আজ ঐশী নিশান, ধরাপৃষ্ঠে বিলুপ্ত প্রায়।
ঐশী শক্তির অধিকারী হের গোলাম মোহাম্মদের ।।

(মূল পার্শি কবিতা হইতে ভাবানুবাদ) : —চৌধুরী আবদুল মতিন

জুমার খোৎবা

হযরত খালিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[স্থান : 'মসজিদে দারুজজেকের', লাহোর, তাং ৮/৩/৭৪ ইং]

"গলবায়ে-ইস্লাম তথা ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বিস্তারের পরিকল্পনা এক মহান পরিকল্পনা। ইহার পূর্ণতা সাধনের দায়িত্ব খোদাতায়ালা আহ্মদীয়া জামাতের দুর্বল কাঁধে অর্পন করিয়াছেন। আহ্মদীয়া জামাতের হৃদয়ে একদিকে খোদাতায়ালার আজমত ও জালাল এবং অন্য দিকে নিজেদের অক্ষমতার অনুভূতি ও কুরবানীর উদ্দীপনা পাওয়া যায়। এ জন্য ইনশাআল্লাহ তাঁহারা কখনও অকৃতকার্য হইবেন না।"

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

দীর্ঘ সময়ের পর আমি এখানে আসিয়াছি এবং আমার চোখে এই মসজিদ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। হয়ত ইহাকে আরো বড় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ও ফজল দ্বারা জামাতের সংখ্যায় ও জামাতের অর্থে এবং জামাতের প্রচেষ্টায় পূর্বাপেক্ষা অধিক বরকত দিতেছেন। আল্হামদু লিল্লাহে আলা জালেকা (তজ্জন্য আল্লাহ্তায়ালারই সম্যক প্রশংসা)।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস সালাম বলিয়াছেন : 'মেরী শেরেশ্ত মেঁ নাকামি কি খামির নেহি।" ("আমার ধাতে অকৃতকার্যতার অংশ নাই।") তাঁহার এই কথা নিয়া আমরা যখন চিন্তা করি, তখন স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন জাগে যে, সেই প্রকৃতি, সেই ধাত, যাহার মধ্যে অকৃতকার্যতার বীজ নাই, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী উহা কি কি যোগ্যতাধিকারী? অর্থাৎ, যখন হযরত মাহ্দী মাহুদ আলাইহেস্ সালাম ইহা বলেন যে তাঁহার ধাতে অকৃতকার্যতার অংশ নাই, তখন জামাতের ইহা চিন্তা করা উচিত যে, ঐ সব সালাহিয়ত (যোগ্যতা) কি, যাহা আমাদিগেরও সাধন করিতে হইবে, যৎপর অকৃতকার্যতার কোন সম্ভাবনাই আর থাকে না। আমরা যখন এই নিয়া চিন্তা করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছাই যে শুধু সেই প্রকৃতি, সেই ধাতেই অকৃতকার্যেতার অংশ থাকে না, যাহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ার আজমতের জ্ঞান এবং তাঁহার 'জালাল পরিচিতি' পুরামাত্রায় থাকে। উহা এমন এক প্রকৃতি যে, উহাতে আল্লাহ্তায়ালার এমন এক প্রেম পাওয়া যায়, যাহার সামনে যাবতীয় পার্থিব প্রেম তুচ্ছ। সুতরাং যে ব্যক্তির প্রকৃতিতে আল্লাহ্তায়ালার 'আজমত', তাঁহার গৌরব ও জালালের চেতনা থাকে, এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেম পাওয়া যায়, উহা কখনও অকৃতকার্য হয় না। আল্লাহ্তায়ালার এই জালাল সম্পর্কীয় জ্ঞানই মাহ্দী মাহুদ আলাইহেস্ সালামের এই জামাতের একটি বিশেষত্ব এবং মুহাম্মদীয় উম্মতেরই

একটি চরিত্র, যাহা এই আখেরী জামানায় পয়দা হইয়া এবং মাহ্‌দী মাহুদের পার্শ্বে একত্রীভূত হইয়া সারা দুনিয়ায় ইসলামকে গালিব কারিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট।

স্থুতরাং যদি কোন প্রকৃতি বা কোন জামাতের জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার আজমত এবং তাঁহার জালাল সংক্রান্ত চেতনা পয়দা হয়, তবে ইহার আরো এক স্পষ্ট ফল এই যে, খোদা ছাড়া, অন্য কিছুরই ভয় উহাতে থাকে না। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌-তায়ালা এই জন্যই বলিয়াছেন: 'আমাকে ভয় কর, আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করিবে না'। স্থুতরাং যে ব্যক্তির এই স্বভাব এবং যাহার জামাতের এই ধাত এবং এই প্রকৃতি, সে আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া অন্য কিছুর বা অন্য কাহারো ভয় তাহার হৃদয়ে পাইবেই না। কারণ তাহার সম্যক অস্তিত্ব খোদাতা'লার আজমত ও তাঁহার জালালের দর্পন স্বরূপ। এহেন মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার সত্বায় বিলীন। তাহার চোখে দুনিয়ার সব জিনিষই তুচ্ছ। সে প্রত্যেক জিনিষই অস্তিত্বহীন বা 'নাই' বলিয়া জানে। স্পষ্ট কথা, যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার আজমত থাকে, যদি তাহার সম্মুখে আল্লাহ্‌-তায়ালার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, তাঁহার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিবার জন্য পৃথিবীর সম্যক শক্তি কখনো একত্রিত হয় এবং সেই ব্যক্তি একাকী থাকেন, তবু বলিবেন--الجمع। ('আল-জাম্‌উ') তথা, 'একত্রিত জন-সমষ্টি, ত বিদ্যমান, কিন্তু سيهزم—'শীঘ্রই তাহারা পরাজিত হইবে।' (সুরা আহ্‌যাব)। বস্তুতঃ, পৃথিবী এই দৃশ্য দর্শন করিতেছে যে, সারা দুনিয়া খোদা-তায়ালার পরিকল্পনার, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। ইহাও এক হকিকত, এক সত্য। কিন্তু ইহাও এক সত্য যে, এই পৃথিবীই এ দৃশ্যও দেখিবে যে, যত শক্তি আছে, যত রাষ্ট্র আছে সকলেই একত্রিত হইয়া এবং সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরী করিয়া খোদা-তায়ালার 'অভিপ্রায়ের' বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করিবে না। দুনিয়া ইহাও দেখিবে যে, যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌তালার খাঁটি ও সাক্ষাৎ প্রেম পাওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি বা ঐ জামাত যাহারা খোদাতালাকেই সমস্ত কল্যাণের মূল উৎস বলিয়া জানে এবং কোন মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন দিকে ধ্যান করে না (এমন কি তাহার নিজ ব্যক্তি ও সত্তার দিকে ও না) সেই ব্যক্তি বা জামাত কখনো অকৃতকার্য হয় না।

বস্তুতঃ, খোদাতায়ালার আজমত এবং তাঁহার জালাল হৃদয়ে পয়দা হওয়া এবং তাঁহার পেয়ার ও প্রীতি এত বৃদ্ধি হওয়া যে, তাহার নিজ সত্তাকেও কিছুই মনে করে না এবং পৃথিবীর কোন ক্ষমতাকেই মঙ্গলের উৎস বলিয়া স্বীকার করে না, ইহা সেই সালাহিয়ত বা সেই যোগ্যতা, ইহা সেই চরিত্র এবং ইহা সেই বিষয় যাহা বিদ্যমান থাকিলে সেই প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব অকৃতকার্য হয় না। এই জন্যই হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস

সালাম) বলেন : میری سر شت میں ناکامی کا خمیر نہیں অর্থাৎ, "আমার ধাতে অকৃতকার্যতার অংশ নাই।" ইহাই তাঁহার জামাতের অবস্থা, যাহারা তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে ইস্‌লামের গাল্‌বার তথা আধ্যাত্মিক বিজয় সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তবু ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের পরিকল্পনা এক মহান পরিকল্পনা, যাহা আল্লাহ্‌তালা আমাদের দুর্বল কাঁধে রাখিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, সারা দুনিয়ায় ইসলামকে 'গালিব' করা—ইহা কোন সহজ কাজ নয়। বর্ত্তমান অর্ধেকেরও বেশী দুনিয়া খোদাকে অস্বীকার করিতেছে। অর্ধেকের অল্পাংশ পৃথিবী বাহ্যতঃ ধর্মের নাম নেয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্মের রূহ বা সারবস্তু সম্বন্ধে আজও অপরিচিত। তাহারা জানেই না যে, ধর্ম কি? যে ধর্মের শরীয়ত ও হেদায়েত খোদার বিনী বান্দাগণকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহা শুধু ইস্‌লামী শরিয়ত (বিধান)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইস্‌লামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত কত জন আছেন, যাহারা ইস্‌লামের মার্যাদা এবং কুরআন করীমের আজমতের জ্ঞান রাখেন? এই মর্যাদা শুধু একটি ক্ষুদ্র জামাতেরই আছে, যাহা যদিও পৃথিবীর কাছে বিতাড়িত, যদিও পৃথিবীর দৃষ্টিতে ইহার কোন সম্মান নাই; যদিও ইহার নিকট দুনিয়ার ধন দৌলত নাই; স্বর্ণ ও মানিক্য নাই, যদিও ইহার স্বর্ণ উদ্‌গিরক ভূমি নাই, তবু ইহার এই একীন, এই অটল প্রত্যয় আছে যে, আমাদের খোদা জীবিত খোদা এবং মানুষকে জিন্দা খোদার দিকে ফিরাইয়া নেওয়ার যে চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে, তাহাতে পরিণামে এই জামাতই জয়ী হইবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এক স্থানে : میرے درخت وجودی کی شاخو ['মেরে দরখতে অজুদকি শাখো!'] "আমার অস্তিত্ব-বৃক্ষের শাখাগণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেই দিন হইতে আহমদীয়া জামাত ভাষান্তরে হযরত মাহ্‌দী মাহুদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের অস্তিত্ব-বৃক্ষের শাখা। আসলত হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বরকতপূর্ণ, মহাকল্যানময় সত্বা। ইহা তাঁহারই বৃক্ষ, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু নতুন শাখা, নতুন কাণ্ড সৃষ্টি হইবে। নতুন সাখা বাহির হইবে। যাহা হউক, এখন মাহ্‌দী আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জাহের হইয়াছেন এবং সেই মহা পবিত্র পুরুষ আসিয়াছেন, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণে আল্লাহ্‌তালার নিরাপত্তা, সালামতী ও হেফাজতে আছেন। খোদার এই ফয়সলা যে, আখেরী জামানায় খোদার দীন গালিব হইবে। আহমদীয়া জামাতের দ্বারা এই ফয়সলা কার্যকরী হইবে। এই পরিকল্পনা পূরা হওয়ার কার্য পৃথিবীতে শুরু হইয়াছে। যদিও ইহা ক্ষুদ্র জামাত, ইহার কোন জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি নাই, রাজনৈ-

তিক হিসাবেও নাই, শিল্পের দিক হইতেও না, জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক হইতেও না, কিন্তু ইহাই একমাত্র জামাত, যাহা এক দিকে আল্লাহ্‌তালার আজমত ও তাঁহার জালালের জ্ঞান রাখে। খোদাকে সকল কুদরতের, সকল মহিমার ও শক্তির মালিক বলিয়া জানে। তিনি ছাড়া অন্য কোন জিনিষের উপর ভরসা রাখে না। তাহারা একথা নিশ্চিত বলিয়া প্রত্যয় করে যে, খোদার আজমত ও তাঁহার জালালের মুকাবিলায় সারা পৃথিবীর শক্তি, সব গুলি শক্তি একত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেও তাহারা জয়ী হইতে পারে না। অন্যদিকে আপন স্রষ্টা, পালন কর্তা প্রভুর এমনই আশেক যে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমে তাহারা আত্ম-বিস্মৃত। তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া শিক্ষানুযায়ী বিনয়ের পথসমূহ অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা অহঙ্কার, গর্ব ও লোক দেখানো ভাব এবং কপটতায় মিশ্রিত হয় না। ইসলাম প্রচারের যে অল্প বিস্তর কাজ তাহারা করে, তাহাতেও আল্লাহ্-তা'লার শোকর আদায় করে, কেননা তাঁহারই দেওয়া সামর্থ্য ও সৌভাগ্য ক্রমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। নতুবা এইটুকু কাজ করিবার যোগ্যও তাহারা ছিল না।

সুতরাং, আল্লাহ্‌তায়ালার আজমত ও জালালের প্রভা প্রদর্শক এই জামাত তাহাদের মাথা সর্বদা জমিনের দিকে নত করিয়া রাখে। এমন কি, তাহাদের নিজ সত্তাকেও কিছুই জ্ঞান করে না। প্রত্যেক মঙ্গল এবং যাবতীয় নেকী, পুণ্য ও সফলতার মূল উৎস এক মাত্র সর্বশক্তিমান খোদাকেই জ্ঞান করে এবং তাঁহারই প্রেমে নিমজ্জিত থাকে। খোদার উপর কামেল ও পূর্ণ মাত্রায় ভরসা রাখে। সর্বদা বিনয়ের পথে চলে। ইহাই তাহাদের সমষ্টিগত ধাত, যাহার সম্বন্ধে হযরত মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম বলিয়াছেন :

میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں

"আমার ধাতে অকৃতকার্যতার অংশ নাই।"

এজন্য একদিকে আমরা খোদার আজমত ও জালালকে চিনি এবং অন্য দিকে এই একীনের উপ কায়েম আছি যে, আমাদের সত্তায় স্বকীয় কোন নেকী বা পুণ্য নাই, স্বাধীন ভিত্তিতে কোনও মঙ্গল, শক্তি ক্ষমতা নাই। বরং, আমরা সব 'খায়ের' বা মঙ্গল আল্লাহ্‌তায়ালা হইতেই লাভ করি। এজন্য আমাদের হৃদয়ে কোন 'ফখর' পয়দা হয় না। আমাদের মাথা উঁচু হইয়া থাকে না, বরং সর্বদা খোদার হুযুরে নত হইয়াই থাকে। আমরা তাঁহার বান্দাদের খেদমত ও সেবায় মগ্ন থাকি। আমরা এই নীতি মানি যে আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দাগণকে যে সব 'হক্' দিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হওয়া চাই। ইসলামী সমাজের ভিত্তি ইহারই উপর সংস্থাপিত। কিন্তু মুসলিম দুনিয়া ইহা ভুলিয়া গিয়াছে, বা ভুলিয়া না যাইলেও ইস্‌লামের শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র বাকী আছে। অথচ ইস্‌লামী শরীয়তের দিক হইতে মুসলমানগণের

উপর ফরজ করা হইয়াছে যে, যত বড় শক্তিই হউক, তাহার যে সব হক আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা তাহার পাইতে হইবে। কখনো কোন বান্দার এই সাহস করা উচিত নয় যে, সে আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে তাহাদের হক হইতে বঞ্চিত করে। ইহা এক অতি মহান, সুন্দর ও প্রিয় সমাজ-ব্যবস্থা। আমাদের ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বেকার মুসলমান বুজুর্গানের জীবনেও পাওয়া যায়। সুতরাং কতই না শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, যদি আমরা এই নীতিকে আপন করিয়া ইহাকে সমাজে প্রচলন করি। যে হক খোদা কায়েম করিয়াছেন, তাহা হইতে বড় চাইতে বড় শত্রুকেও বঞ্চিত করা যায় না। ইস্‌লামের শিক্ষা মানুষের যে হক দিয়াছে, তাহা অতি মহান। খোদা বলিয়াছেন: প্রত্যেক ব্যক্তি, তোমার বন্ধু হউক বা তোমার শত্রু হউক, তোমার আত্মীয় হউক অথবা অন্য কেউ হউক, যাহাকে তুমি চেন না, বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই তোমাদের উপর এই হক রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার ব্যক্তি ও আত্মায়, তাহার পরিবেশে যে সব শক্তি ও যোগ্যতা রাখিয়াছেন, উহাদের পূর্ণ বিকাশ ও পরিপোষণ হওয়া চাই। তোমাদের অবশ্য কর্তব্য যে, তোমাদের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্কাদি যেমনই হউক তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তোমরা দেখিবে যে, সে তাহার হক পায় কি না। তাহার যাবতীয় খোদা-তায়ালার দেওয়া ক্ষমতা ও যোগ্যতার পূর্ণ পরিপোষণ হইতেছে কি না? যদি হইতেছে না, তবে পরিপোষণের ব্যবস্থা কর। ইহা এক সুন্দর শিক্ষা। এই ধারণা বা সত্যটি সম্ভবতঃ কোথাও ফাঁপা কথায় প্রকাশ হইলে, হইতেও পারে, কার্য্যতঃ ব্যবহারিক জীবনে কোথাও দেখা যায় না। এই বিশেষত্ব শুধু ইস্‌লামেরই আছে। ইস্‌লামী শিক্ষার উপর সার্বিক ও সমষ্টিগত পর্যায়ে প্রথম যুগেই আমল করা হইয়াছে। তারপর কোন কোন ব্যক্তি বা দল পরে বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা পালন করিয়াছে এবং এখন উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আহ্‌মদীয়া জামাত দ্বারা ইহার ভিত্তি রাখা হইয়াছে। ইস্‌লাম পৃথিবীতে 'গালিব' হইবে এবং এক সুন্দর সমাজ কায়েম হইবে। উহাতেই প্রত্যেক মানুষ তাহার হক পাইবে। কোন ব্যক্তি মানবাধিকার হরণের সাহস করিবে না। অবশ্য উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ পন্থা গ্রহণ প্রয়োজন। নিজ আত্মাকে একটি মৃত কীট অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করা অত্যাবশ্যক।

সুতরাং, যদিও কুরআন করীম সফলতার আরো অনেক উপায় বলিয়াছে, কিন্তু যেহেতু এখন আমি কোন দীর্ঘ খোৎবা দিতেছি না, (কারণ ৮।১০ দিন যাবত আমাশায় রোগে ভুগিতেছি এবং সে জন্য দুর্বলতা আছে) সেহেতু সামুহিক রূপে আহ্‌মদীয়া জামাতে বিদ্যমান উক্ত দুইটি গুণের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমি বলিয়াছি, যখন মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌-

তায়ালার আজমত ও জ'লাল পয়দা হইয়া যায়, ফলে চরম বিনয় ও নম্রতা বোধ এবং কুরবানীর স্পৃহা জাগ্রত হয়, তখন মানুষ অকৃতকার্য হয় না।

আমাদের জামাত একটি ক্ষুদ্র জামাত। কিন্তু খোদা-ভীতি ও খোদার পথে দান [খাশিয়াতুল্লাহ্ ও ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্] এই দুইটি গুণের দিক দিয়া ইহার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিগত সালানা জলসায় আমি জামাতের সম্মুখে একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। আমি পরিকল্পনাটি ঘোষনার পূর্বে অনেক চিন্তা করিয়াছি। অনেক দোওয়া করিয়াছি। বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, এই উপলক্ষে আমার দিক হইতে শুধু আড়াই কোটি টাকার 'মালী--তহ্রীক' হওয়া চাই। তবু আমার মন বলিতেছিল যে, আল্লাহ্তায়ালা বড়ই অনুগ্রহকারী। এ জন্য এই টাকা পাঁচ হাজার পর্যন্ত পৌঁছিবে। ফলে সালানা জলসায় যখন আমি পরিকল্পনাটি ঘোষণা করিলাম, তখন ইহার একটা খসড়া বর্ণনা করিয়াছিলাম, (বিস্তৃত আকারে ইন্‌শা-আল্লাহ্ শুরা মজলিসে বলিব,) সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্তায়ালার ফজলে আমার আশা আছে যে, এই টাকার পরিমাণ আড়াই কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি পর্যন্ত পৌঁছিবে। আজ আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই পরিকল্পনার জন্য ওয়াদার পরিমাণ পাঁচ কোটির উর্ধ্বে উঠিয়াছে। فالحمد لله على ذالك (তজ্জন্য আল্লাহ্তায়ালারই সম্যক প্রশংসা)।

এখন আমার ধারণা, ইহার পরিমাণ ৯ কোটি টাকা, বরং তারও উপরে হইবে। আমি বিলাতে কোন এক খোতবায় নাম নিয়া বলিয়াছিলাম যে, বাহিরের ৫১টি দেশের ওয়াদা এখনও পাওয়া যায় নাই। এখন পর্যন্ত উহাদের মধ্যে কেবল ১১টি দেশের ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে। তারপর দেশের অভ্যন্তরস্থ অনেক জামাতের ওয়াদা এখনও পাওয়া যায় নাই। কারণ আমি 'মশাওরত' পর্যন্ত ওয়াদা প্রাপ্তির মেয়াদ ধার্য করিয়াছি এবং মশাওরতের এখনও কয়েক দিন বাকী আছে। ইহা ছাড়া যে সকল জাতি তরঙ্গমালার ন্যায় আহ্মদিয়তে দাখিল হইবে, বা আমাদের শিশু ও যুবকরা শিক্ষা শেষে আগামী ১৫ বৎসরে অর্থোপার্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহারা ত এখনো এই পরিকল্পনায় যোগদান করে নাই। তরুণদের কথা ত আমরা জানি না, এবং তাহারাও জানে না যে, আল্লাহতালা কত অর্থনৈতিক রহমত তাহাদের প্রতি নাজেল করিবেন। সুতরাং, এখনও ত সময় আছে। আরো অনেকের নিকট হইতে যথাসময়ে ওয়াদা পৌঁছিবে। তাহারাও প্রতিযোগিতার সহিত অনেক বর্ধিত হারে এই তহরীকে যোগদান করিবে। এই প্রকারে ত সম্ভবতঃ এই টাকা নয় কোটির চেয়েও উপরে উঠিবে। নীতিগত ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতাপ ও আজমত মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় এবং

মানুষ নেহাৎ নত হইয়া সকাতরে খোদার দিকে ঝুঁকে এবং 'রিয়া' (লোক দেখান কপটতা) ও অহঙ্কার এবং ফখর ছাড়িয়া দোয়ায় মশগুল হয়, তখন খোদাতায়ালা তাহাকে কোন জিনিষ হইতেই বঞ্চিত রাখেন না। আমি দেখি যে, যে নীতির আধীনে আল্লাহতায়ালা তাঁহার এই প্রিয় ও মাহ্‌বুব জামাতকে জড় উপায়েও অনুগৃহীত করিতেছেন, এবং যতই প্রয়োজন হয়, ততই মাল দেন, সেই জন্য আমি বলি যে, আমরা আধ পয়সাও নষ্ট করিবার জন্য পাই নাই। জামাতকে বড়ই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে এবং খুব সতর্ক ভাবে মালের হেফাজতও করিতে হইবে এবং বড়ই সাবধানে খর্চাও করিতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম, আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে আমরা এই শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধনে যদি এমন কোন পর্যায়ে পৌঁছি, যেখানে ইশাআতে ইসলাম, তথা ইসলামের বিস্তার সাধনের জন্য আমাদিগকে বিশ কোটি টাকা কুরবানী পেশ করার প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ কোটিরও সামান পয়দা করিবেন। ইন্‌শা আল্লাহুল আজিজ।

যাহা হউক, আমাদের দিল্ আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দে ভরপূর। কারণ উহা হৃদয়ের এক ধ্বনি ছিল, যাহার সম্বন্ধে মশবেরা করিবার পর আমি ইহাই সমীচীন মনে করি যে, আমি উহার জন্য মুতালাবা বা দাবী করিব না, শুধু উহা ঘোষণা করিব। আজ খোদাতায়ালা একমাত্র স্বীয় ফজল বশতঃ (কখনো গর্দন উপরে তুলিবে না, কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ছাড়া এই কাজ হইতেই পারিত না) এবং শুধু তাঁহার রহমত ও বরকত বশতঃ এমন সামান পয়দা করিয়াছেন যে যদিও আড়াই কোটি টাকার তাহ্‌রীক করা হইয়াছিল এবং হৃদয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা হইয়াছিল পাঁচ কোটি টাকার, তথাপি এখন পর্যন্ত পাঁচ কোটি তিন লক্ষেরও উর্ধে ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যহ ডাকযোগে ওয়াদা পৌঁছিতেছে। (উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত শত বার্ষিকী জোবিলী ফাণ্ডে সর্বশেষ মোট ওয়াদা সাড়ে বার কোটি টাকারও উর্ধে উঠিয়াছে। (সম্পাদক)

সুতরাং আমাদের ত এই দোওয়া হওয়া চাই, খোদা তুমিই তোমার সর্বশক্তিমান হস্ত সঞ্চালনে ইসলামের গালবার জন্য আহ্‌মদীয়া জামাত কায়েম করিয়াছ। এখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে জিনিষেরই প্রয়োজন হয়, জড় উপকরণের হউক বা অপার্থিব (আধ্যাত্মিক) উপাদানের হউক, খোদা! তুমি তোমার আপন ফজল দ্বারা তাহা প্রাপ্তির উপায়ও করিয়া দাও। এবং আমাদিগকে তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় ইসলামকে গালিব করিবার এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম মানব হৃদয়ে সৃষ্টি করিবার তওফিক দাও। আমরা এক মহান পরিকল্পনা শুরু করিয়াছি। খোদা! তুমি তোমার ফজল দ্বারা এই পরিকল্পনাকে সফলতার জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে সরবরাহ কর। আমরা ত অদৃশ্য বিষয় জানি

না এবং আমাদের দৃষ্টি ইহলৌকিক জীবনের ব্যপকতাকেও আয়ত্ব করিতে পারে না। আমাদের দৃষ্টি সীমিত, সংকীর্ণ। কিন্তু হে আমাদের রাবব্! তুমি 'আল্লামুল গুয়ুব'-তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় সম্যক জ্ঞত। তোমার দৃষ্টি হইতে কোন জিনিষই লুক্কায়িত নয়। তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের মহিমা দ্বারা এরূপ পরিবর্তন প্রদর্শন কর, যাহা ইসলামের গালবা ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজন।

ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি, শিশু হউক বা যুবক, ছোট হউক বা বড়, পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক, প্রত্যেকের ইহাই আকাঙ্খা যেন সচক্ষে ইসলামের গালবা প্রত্যক্ষ করে। এই শত বার্ষিকী আহ্মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনাটির বিষয়ই নিন্, যাহা সারা দুনিয়ায় ইস্লামকে গালিব করিবার একটি দিব্য কার্য, এই প্রসঙ্গে রোজ এমন অনেক পত্র পাই, যাহা ৭০/৭৫ বরং ৮০ বৎসর বয়স্ক আহ্মদী বন্ধুগণের লিখিত। তাঁহারাও এই পরিকল্পনায় মহা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়া অংশ গ্রহণ করিতেছেন এবং বয়সাধিক্য সত্বেও তাঁহারা এই আকাঙ্খা করেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে স্বচক্ষে ইসলামের প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বিস্তারের দৃশ্য দর্শন করেন।

অতএব, আমরা এই দোওয়া করিতেছি যে, হে আল্লাহ্! আমরা জানি না, কত অর্থের প্রয়োজন এবং কত উপকরণ আবশ্যক। আমাদের ত আগ্রহ এই যে আমাদের জীবনে ইস্লাম বিজয়ী হউক এবং আমরা স্বচক্ষে মানব জাতিকে হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়িতে দেখি।

বন্ধুগণ বিনয়াবনত হইয়া কাতর ভাবে দোয়া করুন। খোদার শোকর আদায় করুন, তাঁহার 'হাম্দ' এবং প্রশংসা গীতি গাহেন, যাহাতে আপনাদের মধ্যে নেক আমলের অদম্য আগ্রহ জন্মে, এবং আল্লাহ্তায়ালা আকাশমালা হইতে ফেরেশ্তাদিগকে পাঠাইয়া পূর্ণ সফলতার উপকরণ সৃষ্টি করেন। (আমীন)

(সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান (ভারত) তাং ২/৫/৭৪ হইতে অনুদিত)

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার

শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ড

ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের মহান পরিকল্পনা ও রুহানী অভিযানকে কামিয়াবীর সহিত জারী রাখার জন্য "শত বার্ষিকী আহ্মদীয়া জুবিলী ফাণ্ড"কে মজবুত করা একটি অতি জরুরী বিষয়।

ওয়াদা আদায়ের এখন তৃতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। ইহাতে আপনাকে মোট ওয়াদার আরো ১৫/১ ভাগ পরিযোধ করিয়া আপনার ওয়াদা আদায়কে ১৫/৩ ভাগে উন্নিত করিতে হইবে।

—সেক্রটারী শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড

(আল ফজল, ৪থা জুন, ১৯৭৬ইং)

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইজতেমা উদ্‌যাপিত

৭ই জুন, চট্টগ্রাম। অদ্য স্থানীয় দারুত তবলীগ মসজিদ ও উহার প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ২দিন ব্যাপী বার্ষিক ইজতেমা খোদার ফজলে সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে।

ইজতেমার প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ৫ই জুন শনিবার বাদ মাগরিব। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে। তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় রবিবার সকাল ৮ টায় মহ্‌তারম আমীর সাহেবের জ্ঞানগর্ভ উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে। চতুর্থ অধিবেশন হয় ঐদিন ৩টা হইতে মাগরিব পর্যন্ত।

এই এজতেমায় তালিম তরবিয়ত সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী খাদেমগণ বিপুলভাবে উপকৃত হইয়াছেন। বাজামাত তাহাজ্জুদ ও ওয়াক্তি নামায, দোওয়া, দরসে কুরআন, দরসে হাদিস ও মলফুজাত-হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর দরস দান করা হয়। উক্ত দরস সমূহ যথাক্রমে সদর মুরুব্বী মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান সাহেব ও জনাব ওবাইদুর রহমান ভূঞা সাহেব। আতফাল ও খোদ্দাম তেলওয়াতে কুরআন নযম-পাঠ, বক্তৃতা ও খেলা-ধুলার প্রতিযোগিতায়ও উৎসাহের সংগে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, তেজগাঁও প্রভৃতি জামাত হইতেও তাহারা এই এজতেমায় যোগ দিয়াছিলেন। দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ইজতেমায় শতাধিক সংখ্যক আতফাল ও খোদ্দাম অংশগ্রহণ করে। সমাপ্তি অধিবেশন 'মতাপিতা দিবস' অনুষ্ঠানে অভিভাবকবৃন্দ সহ প্রায় দুই শতাধিক সদস্য উপস্থিত হন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহু)। এই অধিবেশনে কুরআন তেলাওত ও নযম পেশ করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস এ, নিজামী এবং স্থানীয় কায়েদ জনাব বি, এ, এম, আব্‌দুস সাত্তার। বিভিন্ন সময়োপযোগী বিষয়াবলীর উপরে তরবিয়তী বক্তৃতা দান করেন সর্বজনাব মৌঃ গোলাম আহ্‌মদ খান, প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জামাত, মৌঃ মকবুল আহমদ খান, আমীর ঢাকা জামাত, মৌঃ বদরুদ্দিন আহমদ এ্যাডভোকেট (রংপুর), মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী চট্টগ্রাম জামাত, মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞা, সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত বাঃ আঃ আহ্‌মদীয়া, এবং অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দীন আহ্‌মদ খাদেম।

ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণে মহতারম আমীর সাহেব যুবকদের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া তৌহিদের বিজয়ের পথে নিরলস অগ্রসর হইয়া যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাকুল্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি সকলের প্রতি প্রেমভরা আহ্বান জানান। বর্তমান সমাজ যে সকল দোষে নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমান্তে নামিয়াছে তাহার স্পর্শ আমাদেরকে লাগিতে পারেনা

বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইমান, এখলাস, তাকওয়া ও তাহারতের চাদরে আবৃত থাকিয়া খলিফার প্রতি আমাদের নিরংকুশ ও সর্বাংগীন আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই উন্নতি ও মুক্তি নিহত বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। অন্যথায় ধ্বংসের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জিন্দেগীকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। আলোচ্য ইজতেমার সন্তোষজনক উপস্থিতিতে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আয়োজনকারী ও যোগাদানকারী সকলকে আন্তরীক মোবারকবাদ জানান। তিনি বলেন, বিশ্বের সকল দেশে জামাতে আহ্‌মদীয়ার সকল শাখা দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি করিয়া যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জামাত পিছনে পড়িয়া থাকিলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। তিনি ঘোষণা করেন, জামাতে আহ্‌মদীয়ার অর্থাৎ ইসলামের বিজয়ের দিন দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আসমানে ফেরেশতাগণ বিজয়ের বিউগল বাজাইতেছে। এ বিজয় প্রতিশ্রুত, এ বিজয় নির্ধারিত, নিশ্চিত, ইহা সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার বহু ঘোষিত ডিক্রী। খোদার ডিক্রী রদ করে এমন কে আছে? সুতরাং আমারাও যাহাতে সেই মহান বিজয়ে শরীক হইতে পারি তজ্জন্য জান, মাল, ইজ্জত ও ওয়াক্তের সর্ববিধ কোরবানী অবিরাম করিয়া যাইতে হইবে। তবেই আমারা চিরবাঞ্ছিত লক্ষ্য—দুনিয়ার বুকে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম)-এর রুহানী ও জেসমানী বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিতে পারিব।

পরিশেষে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন মহতারম আমীর সাহেব।

উল্লেখ্য যে, এই ইজতেমায় স্থানীয় খাদেমগণ যে উৎসাহের সহিত কোরবানী পেশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই আনন্দের বিষয়। তাহারা দিবরাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থানীয় মজলিসের কর্মকর্তাগণ যথা কায়েদ বি. এম. এ. আব্দুস সাত্তার, বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস, এ নিযামী, জনাব সামসুর রহমান, মৌঃ মাহ্‌মুদুর রহমান, ও মৌঃ আহ্‌মাদুর রহমান সাহেবান এবং তাহাদের অন্যান্য সকল সহকর্মী। বিশেষতঃ জামাতের জেঃ সেক্রেটারী জনাব নূরউদ্দীন সাহেব দৃষ্টান্তমূলক খেদমত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এজতেমার সর্বাংগীন সাফল্যের জন্য মহতারম আমীর সাহেব গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এজতেমার শেষ পর্যায়ে আলাদাভাবে কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নায়েব সদর সাহেবের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা এবং তাঁহার সঙ্গে বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস, এ নিযামী সহযোগিতা করেন।

সর্বক্ষণ দোওয়া ও এস্তেগফারের মধ্য দিয়া ইজতেমার সকল কাজ ইমান তাজাকারী রুহানী পরিবেশে সমাধা হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোস এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব্ ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৯৯ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমারা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভূ ও অভিভাক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা', অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar